জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 MAY 2005

পৃষ্ঠা - ৭ ... কলাম - ১

নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, বদল হয় শুধু প্রকল্প!

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ এক দশকে আগে সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাটে নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়ার মাইলফলক স্থাপন করা হয়। প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা ঘোষণা উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যে সাজসাজ রব পড়েছিল, ছড়িয়েছিল প্রশংসার ফুলঝুরি তা এখন কর্পূরের মতো উবে গেছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

বিদ্যা যখন বাণিজ্য-৩

মহা আড়ম্বরে নিরক্ষরমুক্ত লালমনিরহাটে সরকারী হিসাবেই ৩৬ ভাগ লোক নাম পর্যন্ত সই করতে পারে না। নিরক্ষরমুক্ত ঘোষিত এবং ঘোষণার অপেক্ষায় প্রস্তুত প্রায় ৪০ জেলায় নাম স্বাক্ষর না করতে পারা লোকের সংখ্যাই এখন বেশি।

(৬ পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

নিরক্ষরমুক্ত দেশ

(প্রথম পাতার পর)

সরকারের প্রায় সাত শ' কোটি টাকার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম)। এভাবেই রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা, লুটপাট, শুভঙ্করের ফাঁকি এবং অপচয়ের শিক্ষণীয় (!) নজির স্থাপন করেছে। দেশের প্রধান সড়কের পাশে এখনও লক্ষ্য করা যায় আলোকিত বগুড়া, পরিকৃৎ কুমিল্লা, দীপ্তিমান সোনারগাঁও প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক শ্লোগানসংবলিত জরাজীর্ণ সাইনবোর্ড।

এ রিপোর্ট লেখার কাজে শতভাগ সাক্ষর লালমনিরহাট আদিতমারী থানাকে বেছে নেই সরেজমিন অনুসন্ধানের জন্য। সঙ্গী জনকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম শাহীন। লালমনিরহাট-বুড়িমারি মহাসড়কের পাশে ৫ নং সাপ্টীবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ঢুকলাম আমরা। চেয়ারম্যান তখন বাইরে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভিজিএফ, ভিজিডি, কাবিখা, টিআরসহ বিভিন্ন খাতের টাকা বা খাদ্যশস্য নেবার সময় সংশ্লিষ্টকে স্বাক্ষর দিতে হয়।

ইউপি সচিব রেকোয়ান পাটোয়ারীর কাছে দেখতে চাই কতজন স্বাক্ষর দিয়ে টাকা, চাল বা গম নেয়? তিনি বলেন, স্বাক্ষর দেয়া লোকের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ। বাকি ৬০ ভাগ টিপসই দেয়। তবে এই ৬০ ভাগের মধ্যে ২০ ভাগের মতো নারী-পুরুষ কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে নাম লিখতে পারে। সময়ের অভাবে এবং তাড়াহুড়া করতে গিয়ে তারা স্বাক্ষর না দিয়ে টিপসই দেয়। রেকোয়ান পাটোয়ারীর কথা এবং সংগৃহীত তথ্য থেকে বোঝা যায়, শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ স্বাক্ষরই দিতে পারে না এবং ২০ ভাগ সময় নিয়ে পারে।

লালমনিরহাট নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা যে শুভঙ্করের ফাঁকি ছিল, তা এখন প্রমাণিত এক নিষ্ঠুর সত্য। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে জানা গেল, ২০০৪ সালের জরিপ অনুযায়ী লালমনিরহাটে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৪ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী বলেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়া, পড়াশোনার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়াসহ নানা কারণেই সাক্ষরতার হার কমেছে।

জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে মূলত বাস্তবায়ন হচ্ছিল সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচী। লক্ষ্মীপুর জেলায় তখন জেলা প্রশাসক ছিলেন বর্তমান সরকারের খাদ্যসচিব একেএম মাহবুব উল আলম। তিনি বলেন, যে কোন জিনিস চর্চা না থাকলে ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। গ্রামের সহজ, সরল এবং জীবন সংগ্রামী মানুষের জন্য এটি বাস্তব। অনেকে শৈশবে কোরআন শরীফ পড়া শিখলেও চর্চা না থাকলে পাঁচ বা দশ বছর পর ভুলে যায়।

লালমনিরহাট থেকে ঢাকা ফিরে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য থেকে কর্মসূচীটির করুণ চিত্র পাওয়া যায়। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ সম্পৃক্ত করে কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিটি জেলা নিরক্ষরমুক্ত করার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। দেশের প্রতিটি নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পে মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল ৩০০ টাকা। আওয়ামী লীগ সরকারের এই পদক্ষেপ শিক্ষায় প্রবল ঝাঁকুনি এবং নিরক্ষরমুক্তির পালে হাওয়া দেয়, আবার কর্পূরের মতো উবেও যায়।

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব ড. সা'দত হুসাইন (শিক্ষা সচিব হিসাবে) এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম ছিলেন সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর তিন কাণ্ডারি। তারা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিলেন, এর প্রভাবে ২০০৬ সাল নয়, ২০০৩ সালের মধ্যেই দেশ নিরক্ষরমুক্ত হবে।

বিষয়টি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক জনকণ্ঠকে বলেন, মূলত রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং সঠিক নেতৃত্বের অভাবে গত সরকারের আমলে গ্রহণ করা এই গুরুত্বসম্পন্ন উদ্যোগ সফল হতে দেয়া হয়নি। যে ধারায় প্রকল্পটি চলছিল, সেটির গতিপথ পাল্টে দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনামাফিক চললে এবং সঠিক নেতৃত্ব থাকলে ২০০৩ সালের মধ্যেই দেশ নিরক্ষরমুক্ত হতো বলে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন।

এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা আহমেদা বেগম মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, বর্তমান সরকার মনে করে এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশ নিরক্ষরমুক্ত করার স্বপ্ন সঠিক ও বাস্তবসম্মত ছিল না।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, এসব সাক্ষরতা দিয়ে কাজ হবে না, প্রাথমিক শিক্ষার ওপরই জোর দিতে হবে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে '৯৩ সাল থেকে পরবর্তী আট বছর 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীতে প্রায় ২৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ও ব্যয়। ২০০১ সালের পর উপবৃত্তি প্রকল্পে একই সরকার ৩৩১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

দেশ নিরক্ষর মুক্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও বিনোয়াগ কম হয়নি। ১৯১৭ সালে স্থানীয়ভাবে নৈশ বিদ্যালয় চালুর মাধ্যমে এ অঞ্চলে প্রথম বয়স্ক শিক্ষার সূত্রপাত। নানা ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৮০-৮২ সালে উপ-রাষ্ট্রপতিকে সভাপতি করে জাতীয় সাক্ষরতা কাউন্সিল গঠন করা হয়। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রত্যেক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ওপর একজন নিরক্ষরকে সাক্ষর করার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব দেন। জিয়াউর রহমান এই কর্মসূচীর মাধ্যমে এক বছরে এক কোটি এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে চার কোটি নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ছাত্ররা শিক্ষিত ব্যক্তিকেই নিরক্ষর হিসেবে দেখিয়ে পরীক্ষায় পার পাবার কৌশল গ্রহণ করলে বিষয়টি হাস্যকর হয়ে ওঠে।

নব্বইয়ের দশকে সরকারী ও বেসরকারী সাক্ষরতা কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক উদ্যম ও উৎসাহ। নিরক্ষরমুক্ত দেশ এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা খাতে আসতে থাকে টাকার জোয়ার। 'গৌরী সেনের' টাকায় কাজের কাজ যত না হয়েছে, তার চেয়ে বেশি চলেছে বিদ্যা বাণিজ্য। বেসরকারী কিছু সংস্থা বিত্তের পাহাড় গড়েছে। বেশির ভাগ এনজিও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আলোচনা, সেমিনার, কর্মশালাসহ বিভিন্ন তাত্ত্বিক চর্চার মাধ্যমে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ করেছে। এছাড়া সরকারী কর্মকর্তাদের অনেকেই 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হয়েছেন।

নিরক্ষরমুক্ত ইস্যুতে সব সময়ই সরকারের সঙ্গে বেসরকারী সংস্থাগুলোর বিরোধ এবং স্বায়ুযুদ্ধ লেগে আছে। এনজিওগুলোর সাক্ষরতা' এবং প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে জোরালো গুঞ্জন হচ্ছে; যত বেশি নিরক্ষর তত বেশি টাকা! দেশে শিক্ষার হার বেড়ে গেলে এটা [illegible] এনজিওগুলোর বাণিজ্য কমে যাবে, এমন আশঙ্কা পুরোপুরি অমূলক নয়। তবে সাক্ষরতায় যৎসামান্য অগ্রগতিতে এনজিওগুলোর ভূমিকাও হেলাফেলা করা যায় না।

শিক্ষার সকল প্রকল্পেই এনজিও নির্বাচনে ঘুষ 'ওপেন সিক্রেট'। এনজিও তালিকাভুক্ত করতে যেমন টাকা লাগে, তেমনি টাকা দিয়ে কাজ নেবার পর কাগজে ধামাবাজি এবং ফাঁকিবাজিরও নজির রয়েছে ভূরি ভূরি।

এদিকে নিরক্ষরতা সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ হচ্ছে, এ বিষয়টি রাজনৈতিক ফায়দা নেবার মোক্ষম হাতিয়ার। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুখ রক্ষায় এবং দেশের ভেতর সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনে নিরক্ষরতা নিয়ে সরকারই সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি, পরিবেশন করে অবাস্তব তথ্য। সাক্ষরতা কর্মসূচীর বেশিরভাগ টাকাই এনজিওর মাধ্যমে ব্যয় করা হয়। সেক্ষেত্রে দেশ নিরক্ষরমুক্ত এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলোর ব্যর্থতা ও দায়ভার কোন অংশে কম দায়ী নয়।

অবসরে যাওয়ার কিছুদিন আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব অধ্যাপিকা (ডা.) তাহমিনা হোসেনের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, অনেকেই চায় না দেশ নিরক্ষরমুক্ত হোক। কারণ এটা হলে অনেক ব্যক্তি ও বেসরকারী সংস্থার কাজ থাকবে না, মোটা অঙ্কের ফান্ডও আসবে না। সরকারের শিক্ষা বিষয়ক অধিকাংশ নীতি নির্ধারকের বক্তব্য এটি। তবে পিপলস এমাওয়ারমেন্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক শিশির শীল বলেন, বিদেশী ফান্ড পাবার জন্য এনজিওগুলো সাক্ষরতার হার কমিয়ে বলছে, এটি মোটেও ঠিক নয়। বরং এনজিওগুলোর উল্লেখ করা হারই সাক্ষরতার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।